dreams for tomorrow

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক দ্বি-মাসিক ম্যাগাজিন

Dreams For Tomorrow

দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা - মার্চ, ২০২৬

স্ফুরণ

বিজ্ঞানের গল্প - স্পেস রেসঃ নাসার একটি মজার অতীত

স্পেস রেসের সময়টা মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক সময়। তখনকার দিনের প্রযুক্তি আজকের ধারে কাছেও ছিল না। জটিল সব হিসেবনিকেশের জন্য এখন আমরা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার ব্যবহার করি। তবে তখনকার দিনে বিশাল সব গাণিতিক সমস্যা সমাধানে মানব মস্তিষ্কই ছিল একমাত্র ভরসা।

বড় বড় গাণিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য নাসার হেডকোয়ার্টারে রাখা ছিল বিশালাকৃতির বোর্ড, চক আর নানা আকারের মই! বিজ্ঞানী/প্রকৌশলীরা মই দিয়ে উপরে-নীচে ওঠানামা করতেন এবং একেকটা লাইন লিখতেন। এভাবে একই সাথে কয়েকজন মিলে সমস্যার সমাধান করতেন। সব হিসেবনিকেশ শেষ হলে এরপর শুরু হতো কোডিং এর কাজ। সেই কোড লোড করা হতো যে কম্পিউটারে তার মেমোরি কতো ছিল জানো? মাত্র ৬৪ কিলোবাইট। আর প্রসেসরের গতি ছিল ০.০৪৩ মেগাহার্জ। আজকের দিনে আমাদের হাতের স্মার্টফোনগুলোর শক্তি এর থেকে হাজারগুণ বেশি। কম্পিউটারের কথা না হয় বাদই দিলাম!

এই ছবিটাই দেখ না! ১৯৬১ সালে তোলা এই ছবিটা আজকের দিনে বিশ্বাস করাই মুশকিল।

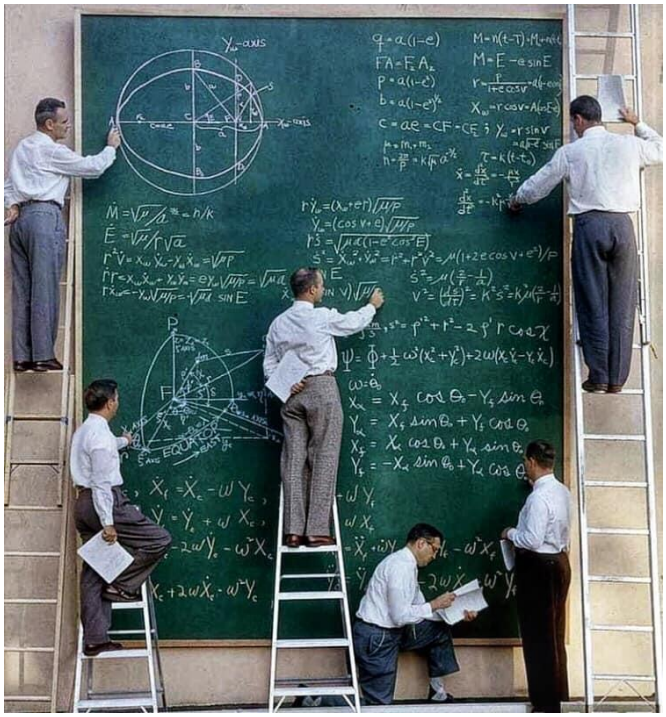

[*নাসা (National Aeronautics and Space Administration (NASA)) হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার সদর দফতর ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।]

প্রশ্নোত্তর

দুটি বরফের টুকরা চাপ দিয়ে ধরে রাখলে তারা জোড়া লেগে যায় কেন?

[উত্তর লিখে WhatsApp করো এই নম্বরেঃ +880 1333-824323]

অবিশ্বাস্য প্রযুক্তি - কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি মানুষের বিকল্প?

Artificial Intelligence বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে কম্পিউটার তথ্য বিশ্লেষণ করে শেখে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সহজভাবে বলতে গেলে, এটি এমন এক ধরনের প্রযুক্তি যা মানুষের চিন্তাভাবনার কিছু অংশ অনুকরণ করতে সক্ষম।

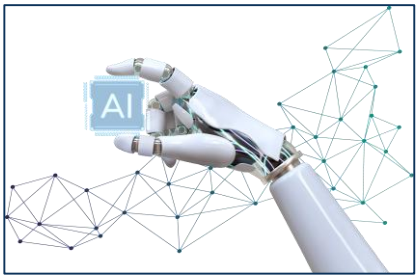

বর্তমানে এআই আমাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। মোবাইল ফোনের ভয়েস সহকারী, ছবি শনাক্তকরণ, ভাষা অনুবাদ, এমনকি চিকিৎসা গবেষণাতেও এর ব্যবহার বাড়ছে। সফটওয়্যার উন্নয়নেও এআই বড় ভূমিকা রাখছে। প্রোগ্রামারদের কোড-লিখতে সাহায্য করা, ভুল খুঁজে বের করা এবং ডিজাইনারদের দ্রুত নতুন নকশা তৈরি করতে সহায়তা করার মতো কাজেও এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি গবেষকরা তথ্য বিশ্লেষণ, কোড লেখা এবং শিক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরি করতেও এআই ব্যবহার করছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এআই উন্নয়নে কাজ করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো OpenAI, যারা মানুষের ভাষা বুঝতে ও ব্যবহার করতে পারে এমন উন্নত এআই প্রযুক্তি তৈরি করছে। এছাড়া Google, Microsoft ও অন্যান্য বড় প্রযুক্তি কোম্পানিও এআই ভিত্তিক সমাধান ও পণ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

তবে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠছে, এআই কি মানুষের চাকরি কেড়ে নেবে? অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ভবিষ্যতে যেসব কাজ সহজে স্বয়ংক্রিয় করা সম্ভব সেগুলোর ঝুঁকি বাড়তে পারে। সেই সঙ্গে নতুন ধরনের কাজও উদ্ভাবিত হবে, যেখানে মানুষের সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও অনুভূতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাই প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন এবং নতুন দক্ষতা শেখা আগের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাই মানুষের বিকল্প নয়, বরং একটি শক্তিশালী সহায়ক প্রযুক্তি। সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে এটি ভবিষ্যতের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, একই সঙ্গে মানব জীবনকে আরও সহজ ও কার্যকর করার সম্ভাবনাও রয়েছে।

বিজ্ঞানী রঙ্গ - নিকোলা টেসলা

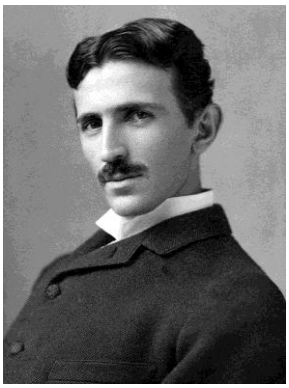

নিকোলা টেসলা (১০ জুলাই ১৮৫৬ -৭ জানুয়ারি ১৯৪৩) সার্বিয়ান-আমেরিকান পদার্থবিদ, তড়িৎ প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক। তিনি পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ (AC Current), এর প্রবাহ ব্যবস্থা এবং আবেশ মোটর আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি দিনে বিশ ঘণ্টা করে পড়াশোনা করতে শুরু করেন। একপর্যায়ে কর্তৃপক্ষকে চিঠি লেখেন তার বাবা, "টেসলা যদি অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তবে তাকে যেন বের করে দেয়া হয়; নয়ত সে মারা পড়বে।"

অসাধারণ মেধার পাশাপাশি টেসলার ছিল কিছু অদ্ভুত স্বভাব। তিনি একটুখানি ময়লা কিছুই ধরতেন না। প্রতিবার খাবার টেবিলে অন্তত ১৮ টি ন্যাপকিন লাগত যা দিয়ে সব আসবাবপত্র মুছে ঝকঝকে করতেন। মুক্তাখচিত গয়নার প্রতি ছিল তীব্র বিদ্বেষ। আর 'তিন' সংখ্যাটির প্রতি তিনি আবিষ্ট হয়ে পরেছিলেন। সেটা এমন যে, বিশেষ কোন কাজে বিল্ডিং এ ঢোকার আগে সেটা তিনবার চক্কর দিতেন!

সম্ভবত তিনি 'অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার' (OCD) নামক এক বিশেষ মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন; যে কারণে এমন অদ্ভুত আচরণ করতেন।

বিজ্ঞানী জীবনী - ড. জামাল নজরুল ইসলাম

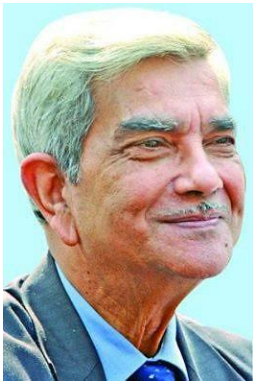

ড. জামাল নজরুল ইসলামের জন্ম ১৯৩৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি, ঝিনাইদহ জেলায়। স্কুলজীবন শুরু হয় কলকাতায়; সেখান থেকে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, শেষে পাকিস্তানের লরেন্স কলেজ থেকে সিনিয়র কেমব্রিজ পাস করেন। বিএসসি সম্মান ডিগ্রি অর্জন করেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে। এরপর বৃত্তি নিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬০ সালে কেমব্রিজ থেকেই মাস্টার্স, ১৯৬৪ সালে কেমব্রিজ থেকেই প্রায়োগিক গণিত ও তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি। এরপর ড. ইসলাম দুর্লভ ও সম্মানজনক ডক্টর অব সায়েন্স (ডিএসসি) ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. জামাল ১৯৬৩-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরাল ফেলো ছিলেন। ১৯৬৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত কেমব্রিজ ইনস্টিটিউট অব থিওরেটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমিতে গবেষণা করেন। ১৯৭১-৭২ দুই বছর ক্যালটেক এ ভিজিটিং অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৯৭৩-৭৪ সালে লন্ডনের কিংস কলেজে ফলিত গণিতের শিক্ষক, ১৯৭৫-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স রিসার্চ ফেলো এবং ১৯৭৮-১৯৮৪ পর্যন্ত মনে সিটি ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন।

বিশ্বখ্যাত কেমব্রিজ প্রেস থেকে তাঁর লেখা 'দ্য আল্টিমেট ফেইট অব দ্য ইউনিভার্স (১৯৮৩)' প্রকাশিত হবার পর বিশ্বের বিজ্ঞান মহলে হৈচৈ পড়ে যায়। মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি কি হতে পারে, এই জটিল বিষয় নিয়ে লেখা তার বইটি জাপানি, ফরাসি, পর্তুগিজ ও যুগোশ্লাভসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। 'রোটেটিং ফিল্ডস ইন জেনারেল রিলেটিভিটি (১৯৮৫)' এবং 'অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টুম্যাথমেটিক্যাল কসমোলজি (১৯৯২)' সহ তার লেখা অন্যান্য বইগুলো কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড, প্রিন্সটন, হার্ভার্ডের মতো বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য।

কেমব্রিজ এবং পশ্চিমে গবেষণা ও অধ্যাপনায় থাকাকালে তাঁর বন্ধু ও সুহৃদমহল গড়ে ওঠে বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের নিয়ে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তাঁর শিক্ষক ফ্রিম্যান ডাইসন, স্টিফেন হকিংস, পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান, ভারতের সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর, পাকিস্তানের আবদুস সালাম, ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও অমিয় বাগচী, তাঁর সহপাঠী জয়ন্ত নারলিকার, ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জিম মার্লিস প্রমুখ।

১৯৮৪ সালে তিনি স্থায়ীভাবে দেশে ফিরে আসেন। যোগ দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক পদে। বিশ্বমানের তত্ত্বীয় ও গাণিতিক পদার্থ বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্য ড. জামাল নজরুল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেন একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। সেখানে মাঝেমধ্যেই কেমব্রিজ থেকে বিখ্যাত ব্যক্তিদের এনে সেমিনার করতেন। এভাবে একবার এসেছিলেন ব্রিটিশ গাণিতিক পদার্থবিদ স্যার রজার পেনরোজ, যিনি স্টিফেন হকিং এর সঙ্গে কাজ করেন। এসেছেন পাকিস্তানি নোবেলজয়ী পদার্থবিদ আব্দুস সালামও। (বাকি অংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

এপোলো-১১ চন্দ্রাভিযানের এক পর্যায়ে নেইল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিনকে নিয়ে লুনার মডিউল 'ঈগল' মূল যান 'কলম্বিয়া' থেকে পৃথক হয়ে চাঁদের মাটিতে নেমে যায়।
ঈগল ফিরে আসার পথে মাইকেল কলিন্স 'কলম্বিয়া'য় বসে এই ছবিটি তোলেন।
ছবিতে দেখা মেলে চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে উঠে আসা লুনার মডিউল 'ঈগল' আর দূরে পৃথিবী!

রসিকতা করে অনেকেই ছবিটিকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের একত্র ছবি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, শুধুমাত্র একজন ছাড়া; আর তিনি হলেন ফটোগ্রাফার মাইকেল কলিন্স! ব্যাখ্যাটা এরকম। পৃথিবীর সব মানুষতো দূরের পৃথিবীতে আছেনই; সাথে চন্দ্রাভিযানের তিন জনের দুজন আছেন ঈগলে। আর স্বাভাবিকভাবেই কলিন্স বাদ পরেছেন। কেননা তিনি কলম্বিয়ায় বসে ছবিটি তুলেছিলেন।

এখন মনেহয়, ইশ! সেই সময় কেন সেলফী ছিল না? তাহলে, পৃথিবীর সব মানুষের সাথে মাইকেল কলিন্সও এঁটে যেতে পারতেন একই ফ্রেমে!

রসিক রসায়ন- জোনাকি পোকা

আঁধারে রাতের জোনাকির স্নিগ্ধ আলো যে কারো মনকেই শীতল করে দেয়। কিন্তু কৌতূহলী মন জানতে চায় এই অদ্ভুত আলোর ব্যাখ্যা।

জোনাকি পোকার এই আলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে 'Bioluminescence' বা জৈব দীপ্তি শব্দটির। এটি আবার কেমিলুমিনিসেন্স বা রাসায়নিক দীপ্তির (Chemiluminescence) একটি ধরন। অনেকেই ভেবে বসতে পারো, শুধু বুঝি জোনাকি পোকাই এ আলো তৈরির বাহাদুরি করতে পারে! কিন্তু না, এ রকম আরও জীব রয়েছে। তবে এদের বেশিরভাগই সামুদ্রিক যেমন ব্ল্যাক ড্রাগন ফিশ, ক্যাট শার্কসহ বিভিন্ন ধরনের মাছ, এক ধরনের স্কুইড, ক্লিক বিটল নামের পোকা। এমনকি এ তালিকায় আছে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের নামও। এখন আমরা জানার চেষ্টা করবো এ আলো কিভাবে তৈরি হয় বা এর রাসায়নিক ব্যাখ্যা কি?

আলো তৈরির প্রধান উপাদান লুসিফেরিন। এর পাশাপাশি লুসিফেরেজ এনজাইম অথবা ফটোপ্রোটিন এ দুটির একটি লাগবেই। লুসিফেরেজ এনজাইমের প্রভাবে লুসিফেরিন অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়। এটিই হচ্ছে সেই বিক্রিয়া যার মাধ্যমে আলো তৈরি হয়। এই বিক্রিয়ায় যে শক্তি উৎপাদন হয় তা আলোক শক্তির আকারে নির্গত হয়। অক্সিলুসিফেরিন নামে একটি যৌগও উপজাত হিসাবে পাওয়া যায়।
এই আলোর সুবিধা কী? জীবগুলো শিকার খোঁজার জন্য, শিকারির হাত থেকে বাঁচার জন্য

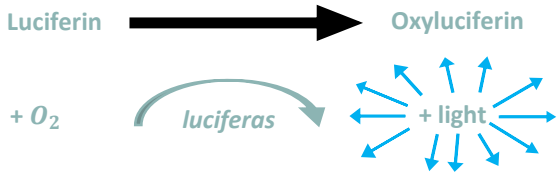

ক্যামোফ্লেজ তৈরি, একই প্রজাতির অন্য প্রাণীকে আকৃষ্ট করা সহ আরো কিছু কাজে ব্যবহার করে। অন্ধকার ঘরে হঠাৎ করে কারো চোখে যদি আলো এসে পড়ে তাহলে সে যেরকম চমকে উঠবে, শিকার করতে আসা সেই প্রাণিও একইভাবে বায়ো লুমিনিসেন্ট আলোর ঝলকে চমকে ফিরে যাবে।

Bioluminescence নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। জীববিজ্ঞানী এবং জৈবরাসায়নিক প্রকৌশলীরা চিন্তা করছেন এই জীবগুলোকে কিভাবে মানুষের কল্যাণে লাগানো যায়। যেমন পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করার জন্য 'Microtox' ব্যবহার করা হয়। এতে থাকে আলো প্রদানকারী ব্যাক্টেরিয়া Vibrio fischeri। যখন পানিতে কোনো বিষাক্ততা থাকে তখন এটির আলোর তীব্রতা কমে আসে। কিছু ছত্রাক গাছে লেগে থেকে আলো তৈরি করে। এই গাছগুলো যদি রাস্তায় ব্যবহার করা হয় তবে রাস্তাও বিদ্যুৎ ছাড়া আলোকিত হবে। সে মৃদু আলোতে হাটতে কেমন লাগবে ভাবতে পারো!

চিন্তা জাগানিয়া ছবি

মেপে দেখো তো রেল লাইনের মাঝে পরে থাকা চাঁদ'টা আর আকাশের চাঁদটার মাঝে কোনটা বড়। একটা কম্পাস বা স্কেল দিয়েই মেপে দেখতে পারবে। আর মাপলেই হবে অবাক। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে?

মেগা স্ট্রাকচার - ওরসান্ড ব্রীজ-টানেল

ওরসান্ড হচ্ছে সমুদ্রের পেট চিরে বানানো সুবিশাল ব্রীজ আর টানেল এর সমন্বয়ে মনুষের হাতে তৈরী এক বিশ্বয়কর স্থাপনা। এটি ইউরোপের দুই দেশ সুইডেন ও ডেনমার্ককে সংযুক্ত করেছে!

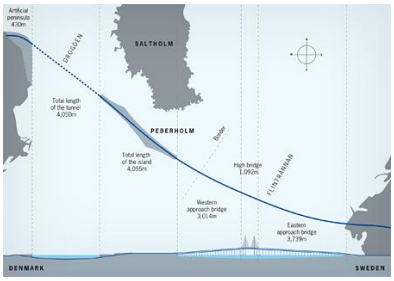

এতে আছে দুটো রেলওয়ে ট্র্যাক আর চার লেনের একটি রাস্তা। হয়তো ভাবছ, ওরসান্ডের পুরোটা ব্রীজ না বানিয়ে এক প্রান্তে ব্রীজ আর অন্য প্রান্তে সুরঙ্গ খোরার দরকার কি ছিল? আসলে, প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল পুরোটাই ব্রীজ বানানোর। কিন্তু ডিজাইন করার সময় দেখা গেলো ব্রীজের উঁচু থামের কারনে ডেনমার্ক প্রান্তের কাছে - কোপেনহেগেন বিমানবন্দরের বিমান চলাচলে সমস্যা হতে পারে।

তাই ডিজাইন পরিবর্তন করে ডেনমার্ক প্রান্তে সুরঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এতে কাঙ্খিত সুইডেন-ডেনমার্ক সংযোগ যেমন সম্ভব হলো তেমনি কোপেনহেগেন বিমানবন্দরের বিমান চলাচলও হলো নির্বিঘ্ন। অবশ্য যোগ হলো বারতি খরচ আর জটিলতা। পুরো কাঠামোটির মোট ওজন প্রায় ৮২,০০০ টন। ব্রীজের মাঝখানে রয়েছে তারে ঝুলন্ত ৪৯১ মিটার দৈর্ঘের তিনটি অংশ। আর ঝুলন্ত অংশগুলোকে পর্যাপ্ত উচ্চতায় রাখা হয়েছে যাতে ব্রীজটির নিচ দিয়ে সহজেই জাহাজ চলাচল করতে পারে।

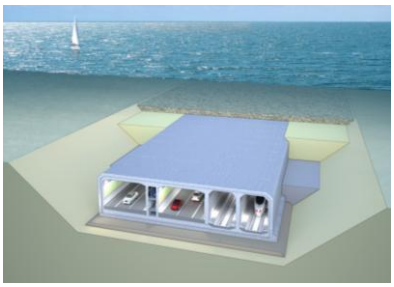

ব্রীজকে টানেলের সাথে সংযুক্ত করতে সমুদ্রের মাঝখানে একটি কৃত্রিম দ্বীপও তৈরী করা হয়েছে যার দৈর্ঘ ৪ কিলোমিটার আধা এবং গড় প্রস্থ কিলোমিটার। টানেলটির মোট দৈর্ঘ ৪.০৫ কিলোমিটার। এর মাঝখানে আছে ৩.৫১ কিলোমিটার দীর্ঘ টিউব আকৃতির একটি টানেল যা সমুদ্রেরর অনেক গভীরে প্রথিত । আর দু'প্রান্তে ২৭০ মিটার দৈর্ঘের - দু'ট সংযোগ টানেল। মাঝের টিউবাকৃতির মূল টানেলটি আসলে রি-ইনফোর্সড কনক্রিটে তৈরী ২০টি পৃথক খিন্ডের সমষ্টি যার এক-একটির ওজন ৫৫,০০০ টন।

টানেলের ভেতর পাশাপাশি সজ্জিত পাঁচটি টিয়বের দু'টো রেলপথের জন্য, দু'টো সরক পথের জন্য ব্যবহৃত হয় আর পঞ্চমটি রাখা হয়েছে জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য। ১৯৯৫ সালে নির্মান শুরু হয়ে ১৪ই আগষ্ট ১৯৯৯ তে এর নির্মান কাজ শেষ হয়। ওরসান্ড ব্রীজ-টানেল এর কাজ শেষ হওয়াকে উৎযাপন করতে ডেনিস যুবরাজ ফ্রেডেরিক ও সুইডিশ রাজকন্যা ভিক্টোরিয়া ব্রীজের মাঝখানে এসে দেখা করেন। ২০০০ সালের ১লা জুলাই রানী ২য় মার্গারেট ও রাজা যোরশ গুস্তাফ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বিজ্ঞান চর্চায় অবদানের জন্য ২০০১ সালে একুশে পদকে সম্মানীত করা হয় অধ্যাপক জামাল নজরুলকে। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি স্বর্ণপদক পান তিনি। ১৯৯৮ সালে ইতালির আব্দুস সালাম সেন্টার ফর থিওরটিক্যাল ফিজিক্সে থার্ড ওয়ার্ল্ড একাডেমি অফ সায়েন্স অনুষ্ঠানে তাকে মেডাল লেকচার পদক দেয়া হয়। ২০১১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজ্জাক-শামসুন আজীবন সম্মাননা পান।

২০১৩ সালের ১৬ই মার্চ চট্টগ্রামের এক হাসপাতালে ৭৪ বছর বয়সে এই ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানী মারা যান। বিজ্ঞানের উন্নয়নের পাশাপাশি তিনি কাজ করেছেন দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়নে। পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ফোরামের সভাপতি হিসাবে দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম নগর ও পরিবেশ উন্নয়নে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। ড. নজরুল স্বপ্ন দেখতেন আমাদের দেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা একদিন দেশে বসেই বিজ্ঞানের মৌলিক শাখায় গবেষণা করে বিশ্ব জয় করবে। (২ এর পাতা হতে)

জীবন্ত জীববিজ্ঞান

পেসমেকার এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র যা মানব দেহে প্রতিস্থাপন করে হৃৎপিণ্ডের অনিয়ন্ত্রিত গতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

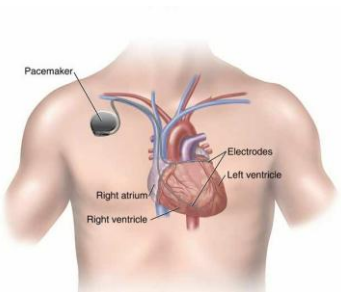

এতে একটি মিনি কম্পিউটার, ব্যাটারি এবং হৃৎপিণ্ডে চার্জ সরবরাহের জন্য একটি লম্বা তার থাকে। এটি বুকের একপাশের অপারেশনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হয়। সংযুক্ত তারটি রক্তনালির মধ্যদিয়ে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে চার্জ সরবরাহ করে।

হার্টের বিভিন্ন অসুস্থতার জন্য পেসমেকার প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে। এটি হার্টের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনবোধে তাৎক্ষণিকভাবে বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে হার্টের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। হার্টের গতি স্বাভাবিক অবস্থায় এলে পেসমেকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এতে পেসমেকারে ব্যাটারির চার্জ দীর্ঘ সময় টিকে থাকে।

তবে যোগফল নিজে দুই অংকের হয়ে গেলে প্রথম অংকটি ধরে ফলাফলের প্রথম প্রথম অংকের সাথে যোগ করে দিতে হবে। যেমনঃ 11X85 -> 8_5 -> 8+5=13-> (8+1)35 -> 935।

11 এর সাথে যে কোন তিন অংকের সংখ্যার গুণফল হচ্ছে চার অংকের একটি সংখ্যা যার প্রথম ও শেষ অংক হবে গুণকের প্রথম ও শেষ অংক। আর মাঝের অংকদুটি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংকের যোগফল। উদাহরণঃ 11X314-> 34
-> 3 (3+1) (1+4) 4 -> 3454।

তবে মনে রেখ, আগের উদাহরনের মত, যোগফল দুই অংকের হয়ে গেলে প্রথম অংক পূর্ববর্তী অংকের সাথে যোগ করে দিতে হবে।

দুই অংকের ঐ সব সংখ্যার বর্গ যাদের শেষে 5 আছেঃ প্রথম অংককে তার থেকে 1 বেশী সংখ্যার সাথে গুণ করে পাশে 25 বসিয়ে দাও। হয়ে গেল! বিশ্বাস হচ্ছে না? চলো, 35 কে বর্গ করি। 352-> 3X4 -> 12 ফলাফল: 1225।

এবার তোমরা বল, মূল সংখ্যাটি তিন অক্ষরের হলে তার বর্গ কিভাবে বের করবে? ঠিক ধরেছ। প্রথম দুই অংকের সংখ্যাটাকে তার থেকে 1 বেশী সংখ্যার সাথে গুণ করে পাশে 25
বসিয়ে দিলেই হলোঃ 3052 30X31 -> 930 -> 930251
দুই অংকের দুটি সংখ্যার গুণফল যাদের প্রথম অংকগুলো এক এবং শেষ অংকদুটোর যোগফল ১০। যেমনঃ 84X86। এক্ষেত্রে প্রথম অংকটিকে তার 1 বেশী সংখ্যার সাথে গুণ কর। আর শেষ অংকদুটো গুণ করে পাশে বসিয়ে দাও। শেষ!
84X86 -> 8X9=72 এবং 4X6=24> ফলাফল 7224।
আজ আমরা মেন্টাল ম্যাথ এর কিছু বিচ্ছিন্ন মজাদার বিষয় সম্পর্কে জানলাম। আগামী দিন থেকে ধারাবাহিক ভাবে কৌশলগুলো আলোচনা করা হবে। শুরুটা হবে যোগ-বিয়োগের সব কৌশল নিয়ে। তোমরা থাকছ তো?

আগামীর প্রযুক্তি - ডিজিটাল মেন্টর

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি নিয়ে এখন কাজ করছে বিশ্বের সব নামী টেক জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান। গুগল ও মাইক্রোসফটের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে এসেছে 'ডিজিটাল মেন্টর', যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষকের মতো কাজ করে। এটি সফলভাবে পরীক্ষিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন স্মার্ট ক্লাসরুমে। ক্লাসে যোগ দেওয়ার পর এই এআই যেমন শিক্ষার্থীর বোঝার ক্ষমতা মেপে নেয়, তেমনি কঠিন বিষয়গুলো সহজ গল্পের মতো বুঝিয়ে দেয়। জটিল গাণিতিক সমাধান থেকে নতুন ভাষা শেখা—সবই হচ্ছে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে। শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বুঝে এটি আবার সঠিক গাইডলাইনের মাধ্যমে তাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। বিশেষজ্ঞরা এর নাম দিয়েছেন 'ফিউচার টিউটর'। 'জেনারেটিভ লার্নিং' প্রযুক্তিতে চালানো হচ্ছে এই ডিজিটাল মেন্টর। এ ধরনের সিস্টেমে রয়েছে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল ও ভয়েস রিকগনিশন। এসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রশ্ন ও শেখার গতি বুঝে এআই মেন্টরটি কাজ করে। আগামীর শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি কেবল তথ্যের উৎস নয়, বরং একজন সত্যিকারের বন্ধুর মতো পাশে থেকে মেধা বিকাশে সহায়তা করবে।

একটুখানি গণিত - গণিত ট্রিক্স

মেন্টাল ম্যাথ হচ্ছে একটা বিশেষ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্রেইনকে এমনভাবে ট্রেইন করা হয় যে কম্পিউটার, ক্যালকুলেটর বা কাগজ-কলম ছাড়াই গাণিতের বড় বড় সব হিসাব-নিকাশ শুধু মুখে মুখে সেরে ফেলা যায়। খুব এক্সাইটিং শোনাচ্ছে, তাই না?

এরকম একজন মানুষ হচ্ছেন আর্থার বেঞ্জামিন। পঞ্চান্ন বছর বয়সী এই প্রফেসরকে জীবন্ত কিংবদন্তী বলা চলে। মেন্টাল ম্যাথে তার দখলের জন্য লোকে তাকে বলে 'ম্যাথম্যাজিশিয়ান'।

চাইলে তুমিও কিন্তু এমন একজন ম্যাথম্যাজিশিয়ান হতে পার । তোমার মাথাটাকে একটা চলমান ক্যালকুলেটরে পরিণত করার জন্য দরকারি সব টেকনিক এই সিরিজে পাবে। তবে মনে রেখ সাঁতার বা সাইকেল চালানো বা এরকম আর সব কৌশল রপ্ত করার মতো 'মেন্টাল ম্যাথের' কৌশলগুলোও তোমাকে বেশ সময় দিয়ে, যত্ন করে প্রাকটিস করতে হবে তবেই তুমি একটা আদর্শ ক্যালকুলেটর হতে উঠবে যে কিনা কয়েক সেকেন্ডে বড় বড় সব গাণিতিক সমস্যা শুধু মাথা খাটিয়ে সমাধান করে ফেলতে পারবে।

তাহলে চলো শুরু করা যাক!

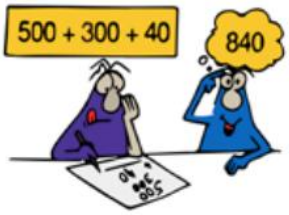

আমরা সাধারণত যোগ, বিয়োগ, গুণ ইত্যাদি ডান দিক থেকে শুরু করে বামে শেষ করি, তাই না? যেমন, ধর বললাম, কাগজে লিখে এই দুটো যোগ করঃ 2300 ও 45। তোমরা প্রথমে 5 ও 0 যোগ করবে, তারপর 4 ও 0, তারপর উপর থেকে ও নামাবে, তারপর 2; তাই না? কিন্তু মেন্টাল ম্যাথের প্রথম টিপস হচ্ছে, তোমাকে সবকিছু বাম দিক থেকে শুরু করতে হবে। কয়েকবার চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে বাম দিক দিয়ে শুরু করলে কাজটা কত সহজ হয়ে যায়!

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেন্টাল ম্যাথ হচ্ছে একটা সমস্যার সরলীকরণ। যেমন, 432X31 আপাতদৃষ্টে কঠিন মনে হলেও এটা আসলে তিনটি সহজ গুনফলের সমষ্টিঃ 400X3=1200, 30X3=90 এবং 2X3=6; 1200+90+6=1296। সহজ না?

উপরের উদাহরণ থেকে আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছ কি? মনে মনে কোন কিছু যোগ করার সময় বড় সংখ্যার সাথে ছোট সংখ্যা যোগ করা সহজ। এর মানে দাঁড়াচ্ছে, বাম থেকে ডানে যোগ করা সহজ।

আরেকটা কারনে 'বাম থেকে ডান' পদ্ধতিটি ভালো। একটা সংখ্যাকে আসলে আমরা বাম থেকে ডানেই পড়ি। তাছাড়া, বাম থেকে শুরু করলে আমরা ফলাফলের সবচেয়ে কাছাকাছি মানটি প্রথমেই পেয়ে যাই। তারপর ধাপে ধাপে ফলাফলে পৌঁছান যায়। চলো আরেকটা উদাহরণ দিয়ে দেখা যাকঃ 54X7=?

কাগজে হলে তুমি হয়ত শুরু করবে, 4X7=28...। কিন্তু মেন্টাল ম্যাথে বাম থেকে শুরু করলে তুমি খুব দ্রুত ফলাফলের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছঃ 50X7 (350)। আর একদম সঠিক ফলাফল পেতে হলে এর সাথে বাকি অংশ অর্থাৎ 4X7 (28) যোগ করলেই হলোঃ 350+28-378! খুব সহজ, তাই না?

পুরোদস্তুর মেন্টাল ম্যাথ শুরু করার আগে চলো কয়েকটা প্রয়োজনীয় ট্রিক্স শিখে ফেলি।

9 এর নামতাঃ 9 এর নামতার প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফলাফলের সংখ্যাগুলোর সমষ্টি কিন্তু 9! যেমন, 9X2=18 এবং 1+8=9। 9X8=72 এবং 7+2=9!

আবার, 9 এর সাথে যে সংখ্যা গুণ করা হোক না কেন ফলাফলের প্রথম অংক বরাবরই ওই সংখ্যার থেকে 1 কম হবে। যেমন, 9X4 এর ফলাফলের প্রথম অংক হবে 3 (4-1=3)। আবার একটু আগে জানলাম যে ফলাফলের অংকগুলোর যোগফল হবে 9। তাহলে 9X4 এর প্রথম অংক ও হলে, দ্বিতীয় অংকটি 6 না হয়ে যায় না। এভাবে, পুরো নামতাটা তুমি এখন কোন মুখস্ত বিদ্যা ছাড়া শুধু দেখেই লিখে ফেলতে পারবে।

11 এর সাথে যে কোন দুই অংকের সংখ্যার গুণফলে হচ্ছে তিন অংকের একটি সংখ্যা যার প্রথম ও শেষ অংক হবে গুণকের দুই অংক। আর মাঝের অংকটি হবে গুণকের অংকদুটির যোগফল। উদাহরণঃ 11X23-> 2_3 -> 2+3=5 -> ফলাফল 253।

(বাকি অংশ ৩ এর পাতায়)

'স্ফুরণ' ড্রিমস ফর টুমরো এর বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গণিত বিষয়ক দ্বি-মাসিক পত্রিকা যা দেশের ৬ষ্ঠ – ১০ম শ্রেণির উপযোগী করে লিখা হয়েছে। বিষয়বস্তু ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত।

এসো নিজে করি - দুঃসাধ্য কাজ

একটা বড় গামলায় একটা ছোট বাটি রেখে পুরোটা পানিতে ভরে নাও। এবার চেষ্টা কর একটা পয়সা বাটির মাঝে ফেলতে। দেখবে ব্যাপারটা খুব একটা সহজ নয়। যখনই তুমি পয়সাটা ফেলছ, সেটা বাটিতে না পড়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে! ভারী সমস্যা তো! কিন্তু কেন হচ্ছে এমন?

পয়সা ফেলার সময় সেটা একটু না একটু বাঁকা হয়ে পড়ে। পানির নিচে যাবার সময় পানির সাথে ঘর্ষণে সেটা আরও বাঁকা হয়ে এক পাশে সরে যেতে থাকে শেষ পর্যন্ত পয়সাটা সাধারণত বাটির বাইরে গিয়ে পড়ে।

তাহলে পয়সাটা বাটির মাঝখানে ফেলতে হলে কি করতে হবে? একটা মার্বেল ফেলে দেখ । সেটা ঠিক ঠিক বাটিতে পড়ছে, তাই না? আসলে মার্বেল হচ্ছে গোলক, এটাতো বাঁকাভাবে ফেলার উপায় নেই। তাই তুমি যেভাবেই ফেল না কেন প্রত্যেকবার সোজাসুজি বাটিতে গিয়েই পড়বে।

জানার আছে অনেক কিছু - ফুটবল প্রযুক্তি

ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রযুক্তি হচ্ছে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (VAR)। এই টেকনোলজিটি প্রথম ব্যবহৃত হয় বড় টুর্নামেন্টে রেফারিদের ভুল সিদ্ধান্ত কমানোর জন্য। ফুটবলে VAR মাঠের বিভিন্ন কোণে থাকা ক্যামেরার ফিড ব্যবহার করে রেফারিকে সাহায্য করে। আমাদের দৃশ্যমান ত্রিমাত্রিক (3D) জগতে যে মাত্রাগুলো আছে (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা) তার বাইরে আরেকটি মাত্রাকে ব্যবহার করে VAR। মাত্রাটি হলো রিভিউ রুমের সাপোর্ট। VAR টেকনোলজির প্রাণ হলো কয়েকটি হাই-স্পিড ভিশন ক্যামেরা। এ জন্য পুরো স্টেডিয়াম জুড়ে অনেকগুলো ব্রডকাস্টার ক্যামেরার পাশাপাশি হাই-স্পিড ভিশন ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। মাঠের বিভিন্ন পজিশনে ক্যামেরাগুলো স্থাপন করা হয়। এগুলো সেকেন্ডে শত শত ফ্রেম গতিতে ভিডিও রেকর্ড করতে থাকে যা সাধারণ টিভি ক্যামেরার চেয়ে অনেক বেশি। মাঠের ভেতর খেলোয়াড়দের যেকোনো স্পর্শকাতর মুহূর্ত বা ফাউল এই ক্যামেরাগুলো অনবরত ভিডিও ধারণ করতে থাকে।

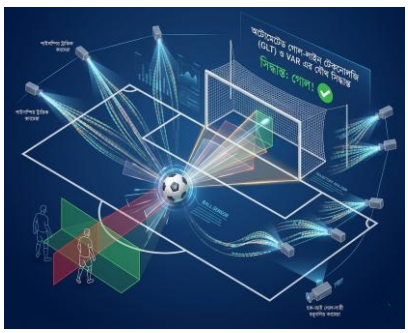

ধরো, কোন পেনাল্টি বা অফসাইড ডিসিশনের জন্য রিভিউ চাওয়া হলো। তখন সব ক্যামেরা থেকে ভিডিও সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কম্পিউটারে পাঠানো হয় প্রসেসিংয়ের জন্য। বিশেষায়িত সফটওয়্যার ভিডিওগুলো থেকে একটা অ্যানিমেটেড প্রজেক্ট তৈরি করে যা প্রথমে বলের গতিপথ এবং ফাউলের গভীরতা যাচাই করে। ২০২৬ সালের ওয়ার্ল্ড কাপে ব্যবহৃত বলগুলোতেও সেন্সর থাকে যা সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে VAR কে সাহায্য করবে।

VAR প্রযুক্তি আসার পর ফুটবলে সরাসরি সম্প্রচারের সময় অনেক নতুন নতুন ফিচার যোগ করা গেছে। যেমন অটোমেটেড অফসাইড নোটিফিকেশন, প্লেয়ার ট্র্যাকিং, বল পজিশন, হিট ম্যাপ ইত্যাদি। এতে খেলা দেখায় বাড়তি বিনোদনের ব্যবস্থা হয়েছে, কোন খেলোয়াড় কেমন পারফর্ম করছে সেটা জানার সুযোগ মিলছে। বলের সঠিক পজিশন জানার জন্য গোল-লাইন টেকনোলজি (GLT) ও VAR একসাথে কাজ করে।

তবে এই প্রযুক্তির দুর্বলতা হলো মাঠের পরিবেশ বা মানুষের আবেগ বুঝতে না পারা। সে যে তথ্য দেখায় তা মূলত ভিডিওর ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু আমরা জানি অনেক সময় রেফারি মাঠের পরিবেশ বুঝে সিদ্ধান্ত দেন। এসব ক্ষেত্রে VAR সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিতর্ক তৈরি করতে পারে।